বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে: আইন, বিধি-বিধান ও নীতিমালা সংস্কারের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ এবং সুপারিশমালা

লেখক

ড: এম সানজীব হোসেন

নাফিসা তাবাসসুম

আল মুকতাদির ইলাহী ইসমাম

সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিস (সিপিজে)

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর ২০২৩

Co-funded by the European Union

BRAC UNIVERSITY
Inspiring Excellence
Centre for Peace and Justice

actionaid

বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে: আইন, বিধি-বিধান ও নীতিমালা সংস্কারের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ এবং সুপারিশমালা

লেখক

ড: এম সানজীব হোসেন

নাফিসা তাবাসসুম

আল মুকতাদির ইলাহী ইসমাম

সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিস (সিপিজে)

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর ২০২৩

Co-funded by the European Union

BRAC UNIVERSITY
Inspiring Excellence
Centre for Peace and Justice

actionaid

ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সহ-অর্থায়নে 'সুশীল: সাপোর্টিং দ্য ইউনিটি এন্ড সাসটেইনেবিলিটি অফ সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনস (সিএসও) টু আপহোল্ড হিউম্যান রাইটস, ন্যাশনাল ইনটেগ্রিটি এন্ড রুল অফ ল ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের অধীনে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। এই প্রকল্পের প্রধান আবেদনকারী একশনএইড বাংলাদেশ এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিস (সিপিজে) হলো সহ-আবেদনকারী।

লেখক

ড. এম সানজীব হোসেন, পরিচালক (রিসার্চ) সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিস (সিপিজে), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।

নাফিসা তাবাসসুম, গবেষণা সহকারী, সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিস (সিপিজে), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।

আল মুকতাদির ইলাহী ইসমাম, গবেষণা সহকারী, সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিস (সিপিজে), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদনা পরিষদ

ড. এম সানজীব হোসেন, নাফিসা তাবাসসুম, আল মুকতাদির ইলাহী ইসমাম, মৌসুমী বিশ্বাস, অমিত রঞ্জন দে, এ জেড এম মৌসুম ইসলাম, নুসরাত আইরীন, কংকন নাগ।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউরোপের ২৭টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত একটি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জোট। মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমতা, আইনের শাসন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষসহ সবার মানবাধিকারের প্রতি সম্মান ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি বিশ্বজুড়ে মানুষের কল্যাণে টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে।

একশনএইড বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা যা সকলের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে কাজ করছে। **একশনএইড** বাংলাদেশ বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই তার নিজেকে, পরিবার এবং সমাজকে পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে একশনএইড বিশ্বের ৭১টি দেশে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে এবং এ পর্যন্ত ১৫ কোটির বেশি মানুষ এই উন্নয়ন সহায়তার অংশীদার হয়েছে। ১৯৮৩ সালে স্থানীয় পর্যায়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশে একশনএইড যাত্রা শুরু করে এবং এ পর্যন্ত ৫০টির বেশি জেলায় কাজ করেছে। একশনএইড একটি ন্যায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে নারী, তরুণ সমাজ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও একশনএইডের সকল কর্মকাণ্ডের প্রধান সূত্র হিসেবে কাজ করে।

সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিস (সিপিজে) একটি বহুমাত্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেটি মানসম্পন্ন শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বৈশ্বিক শান্তি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে উৎসাহিত করতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সিপিজে, বিশ্বের বিভিন্ন সংকট এবং সমস্যাকে চিহ্নিত করা এবং সেগুলোর টেকসই এবং অংশগ্রহণমূলক সমাধান বের করতে বদ্ধপরিকর। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে এই সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সেন্টারের সাথে যুক্ত হয়।

কৃতজ্ঞতা

মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সময় **বিভিন্ন সিএসও'র যে ১৩৫ জন প্রতিনিধি** আমাদের কাছে উন্মুক্তভাবে বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন তাঁদের সহায়তা ছাড়া এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হতো না। আমরা তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।

আমরা সিপিজে'র সহকর্মী **(নিলুফা সুলতানা, তাসনিয়া খন্দকার প্রভা, হোসেন মোহাম্মদ ওমর খৈয়াম, লিটন কুমার রায়, মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম এবং তাজমিনা তারান্নুম)**- এর অসাধারণ অবদানকে স্মরণ করি। এছাড়া, একশনএইড-এর সহযোগী **(মৌসুমী বিশ্বাস, মরিয়ম নেছা, এ জেড এম মৌসুম ইসলাম, নুসরাত আইরীন, সামিহা আলী এবং অসীম রহমান)** এবং সুশীল প্রকল্পের আওতায় ন্যাশনাল ইনসেপশন ওয়ার্কশপে অংশ নিয়ে বিভিন্ন এনজিও'র যেসব প্রতিনিধি প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করতে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। এফজিডি এবং আইডিআই-গুলোর প্রতিলিপি তৈরি করার জন্য **তাসনিয়া খন্দকার প্রভা ও হোসেন মোহাম্মদ ওমর খৈয়াম**কে এবং এর সম্পাদনায় সহযোগিতার জন্য **অহনা আজাদ চৈতি**কে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশের ৯টি জেলায় মাঠ পর্যায়ের কাজগুলোকে অসাধারণভাবে সমন্বয় করার মাধ্যমে আমাদের গবেষণার ভিত্তি তৈরি করে দেয়ার জন্য **মৌসুমী বিশ্বাস এবং নিলুফা সুলতানাকে** বিশেষ ধন্যবাদ। আমাদেরকে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমরা **মনতোষ দেবনাথ এবং কামরুল** সাহেবের অবদানকে স্মরণ করি।

এবং সবশেষে আমরা **মনজুর হাসান, ফারাহ কবির এবং শাহরিয়ার সাদাতকে** কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই কেননা তাঁরা আমাদের এই গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন।

সূচিপত্র

সংক্ষিপ্ত শব্দের তালিকা	৪
সার-সংক্ষেপ	৫
ভূমিকা	৬
অধ্যায় ১: গবেষণার পরিকল্পনা, পদ্ধতি এবং সীমাবদ্ধতা	৭
অধ্যায় ২: তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে বাধাসমূহ	৯
আস্থাহীনতা এবং স্বাধীনভাবে চলতে গিয়ে তৃনমূল সিএসও'র অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া	
নিবন্ধনের মাধ্যমে তৃণমূল সিএসওদের স্বাধীন সত্ত্বা বাধাগ্রস্ত হওয়া	১২
নিবন্ধন এবং পরবর্তী সময়ে সিএসওদের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার চিত্র	১৪
তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের মাঝে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা	২০
উপসংহার এবং সুপারিশমালা	২১
পরিশিষ্ট	২২

সংক্ষিপ্ত শব্দের তালিকা

সিএসও	সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন
ডিসি	ডেপুটি কমিশনার
ডিএসএস	ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল সার্ভিসেস
ডিডব্লিউএ	ডিপার্টমেন্ট অফ উইমেন অ্যাফেয়ার্স
ডিওয়াইডি	ডিপার্টমেন্ট অফ ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট
এফজিডি	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন
আইডিআই	ইন-ডেপথ ইন্টারভিউ
এমআরএ	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি
এনজিও	নন-গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন
এনজিওএবি	এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো
এনএসআই	ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনটেলিজেন্স
এসবি	স্পেশাল ব্রাঞ্চ
ইউএনও	উপজেলা নির্বাহী অফিসার

সংক্ষিপ্তসার

বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের কারণে বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে সিএসওদের কাজের পরিবেশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের ৯টি জেলার ১১৪টি সিএসও'র ১৩৫ জন প্রতিনিধির সাথে দীর্ঘ মতবিনিময়ের সময় যেসব চ্যালেঞ্জের কথা উঠে এসেছে সেগুলো হলো:

- ❖ সার্বিকভাবে কমিউনিটি ও সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের সাথে বড় ও প্রতিষ্ঠিত এনজিওগুলোর মধ্যে আস্থার সংকট রয়েছে;

- ❖ স্বাধীনভাবে কাজ করার সময় মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন সব সিএসওদের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির শিকার হওয়া;

- ❖ সরকারি সংস্থার সাথে নিবন্ধন করার মাধ্যমে সিএসওদের স্বাধীনতা খর্ব হওয়া এবং যখন একটি সিএসও তার সংগঠনকে নিবন্ধন করার চেষ্টা করে বা সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করে তখন দুর্নীতি এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়;

- সিএসওদের নিজস্ব কিছু দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলোর মূল কারণ হলো: অনেক সিএসও তাদের মূলনীতির বাইরে চলে যাওয়ার কারণে সময়ের সাথে সাথে তাদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে।

- সিএসওদের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনীতিকরণ হওয়ায় সরকার ও সিএসও'র মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্কটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

- সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে নিবন্ধিত হওয়ার মাধ্যমে সিএসওরা অনেক বেশি সুগঠিত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক সহায়তা পেয়েছে। তবে, নিবন্ধনের মাধ্যমে তারা তাদের স্বাধীনতাকেও অনেক ক্ষেত্রে খর্ব হতে দিয়েছে।

- বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আইন, বিধি ও নীতিমালা সংস্কারের ক্ষেত্রে, উপযুক্ত চ্যালেঞ্জগুলোকে অবশ্যই আমলে নিতে হবে।

ভূমিকা

সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (সিএসও) বলতে সামাজিক সংগঠন বোঝানো হয়ে থাকে যা অন্তত তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রীয়, বাণিজ্যিক সংস্থা এবং অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। সিএসওর মূল কাজ হচ্ছে সরকার ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে "মানুষের অগ্রাধিকার, আগ্রহের জায়গা এবং সংকটসমূহকে তুলে ধরা"[১] (আইসিএনএল ২০২০: ৫), যাতে করে একটি ন্যায়পরায়ণ, সমতা ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। সিএসওর সাথে এনজিওর একটি সম্পর্ক আছে যা শুরুতেই পরিষ্কার করা প্রয়োজন। সহজ ভাষায় বললে, সব এনজিও কোনো না কোনোভাবে সিএসও হলেও, সব সিএসও এনজিও নয়। বাংলাদেশে সিএসওর মূল আইনি ভিত্তি হচ্ছে সংবিধানের (সংবিধান) ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদ যা সকল নাগরিককে "জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার" দিয়েছে। সংবিধানের আরো কয়েকটি অনুচ্ছেদ বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরণের সিএসওকে শক্তিশালী করে, যার মধ্যে রয়েছে, অনুচ্ছেদ ৭ (সংবিধানের প্রাধান্য), অনুচ্ছেদ ১১ (গণতন্ত্র ও মানবাধিকার), অনুচ্ছেদ ২১ (নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য), অনুচ্ছেদ ২৭ (আইনের দৃষ্টিতে সমতা), অনুচ্ছেদ ২৮ (ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য), অনুচ্ছেদ ৩৯ (চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা), এবং অনুচ্ছেদ ৪১ (ধর্মীয় স্বাধীনতা)। আমাদের সংবিধানের বাইরেও আরো বেশ কিছু আইন রয়েছে যেগুলো সাধারণত নিবন্ধিত সিএসওদের কার্যক্রমকে পরিচালনা করে।[২] এগুলোর মধ্যে রয়েছে: সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০; ট্রাস্ট আইন ১৮৮২; বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৬; স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১; ওয়াকফ অর্ডিন্যান্স ১৯৬২; কোম্পানি আইন ১৯৯৪; সমবায় সমিতি আইন ২০০১; মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন ২০০৬; যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫। এর বাইরেও আরো কিছু আইন সিএসও'র কার্যক্রমের উপর প্রভাব বিস্তার করে।[৩] এসবের মধ্যে রয়েছে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮; মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১৬; সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯; ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮, ইত্যাদি।

বাংলাদেশে সিএসওগুলো নানা ধরনের বিষয় নিয়ে কাজ করে। যার মধ্যে রয়েছে, মানবাধিকার, সমাজ কল্যাণ, মানব উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি। এই গবেষণায় 'তৃণমূল সিএসও' বলতে সেইসব সংগঠনকে বোঝানো হচ্ছে যারা, তুলনামূলকভাবে ছোট পরিসরে এইসব বিষয় নিয়ে কাজ করে। সাধারণত তৃণমূল সিএসওর কার্যক্রম বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিসীমার আড়ালেই থেকে যায়। বেশ কিছু তৃণমূল সিএসও নিবন্ধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে যুক্ত থেকে কাজ করে। অন্যদিকে কিছু তৃণমূল সিএসও অনিবন্ধিতই থেকে যায়। সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও অন্যান্য আইনি সুরক্ষা থাকার পরও বাংলাদেশে সিএসওদের কার্যক্রম নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি হলেও, তৃণমূল সিএসওদের জন্য উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ এখনও সৃষ্টি হয়নি। তাই, তৃণমূল সিএসওগুলো যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সে বিষয়ে আরো পরিষ্কার ধারণা তৈরির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

দুই ভাগে বিভক্ত এই প্রতিবেদনটি মূলত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিস - সিপিজে'র গবেষকদের দ্বারা পরিচালিত বেশকিছু ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) এবং ইন-ডেপথ ইন্টারভিউ (আইডিআই) থেকে সংগৃহীত তথ্য ও মতামতের উপর ভিত্তি করে একটি গবেষণা। এটি সিএসও তাদের কাজ

[১] ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর নট-ফর-প্রফিট ল (২০১৯), লিগ্যাল ম্যানুয়াল ফর সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনস ইন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা ৫, https://www.icnl.org/wp-content/uploads/12.2019-Bangladesh-Operational-Guide-ENvf-digital.pdf

[২] আইবিআইডি পৃষ্ঠা, ১১-১২

[৩] আইবিআইডি পৃষ্ঠা, ১২

করতে গিয়ে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে সেগুলোর উপর আলোকপাত করেছে এবং একইসাথে সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার সম্ভাব্য সুপারিশমালা দিয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে এই গবেষণার পরিকল্পনা, পদ্ধতি এবং এর সীমাবদ্ধতাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যেটি কিনা এই গবেষণার মূল অংশ, সেখানে বাংলাদেশের ৯টি জেলায় ১১৪টি সিএসও'র ১৩৫ জন প্রতিনিধির দীর্ঘ বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করাসহ সিএসওদের কাজ করতে গিয়ে মুখোমুখি হওয়া বিভিন্ন জটিলতাগুলো সম্পর্কে আরো গভীর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই গবেষণাটি তৃণমূল সিএসওদের জন্য কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ ও বাধা রয়েছে সেগুলোর উপরও বিস্তারিত আলোকপাত করে। গতানুগতিক উপসংহারের পরিবর্তে এই গবেষণায় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সম্ভাব্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে উঠে আসা চ্যালেঞ্জ এবং পরামর্শগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে সিএসও সংক্রান্ত নীতিমালা, বিধান এবং আইন সংস্কার করলে তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির পথ প্রসারিত হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

অধ্যায় ১: গবেষণার পরিকল্পনা, পদ্ধতি এবং সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে সিএসও'র জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেসব বাধা রয়েছে তা বের করার সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি হলো, যত বেশি সংখ্যক সিএসও প্রতিনিধির সাথে বিশদভাবে আলোচনা করা। এই বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে গবেষকরা একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগীতায় সুশীল প্রকল্পের আওতায় ০৬-০৭ জুন'২০২৩ অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল ইনসেপশন ওয়ার্কশপে অংশ নেয়া বিভিন্ন সিএসও'র প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার পর একটি সেমি-স্ট্রাকচার্ড প্রশ্নমালা তৈরি করে। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও এই প্রশ্নমালায় এফজিডি এবং আইডিআইতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের তাদের সংস্থার কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে এমন সব আইন ও নীতিমালার বিষয়ে প্রশ্ন রাখা হয়। এছাড়া, তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সিএসও'রা যেসব চ্যালেঞ্জ ও বাধার সম্মুখীন হয় সেগুলো চিহ্নিত করে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেয়া এবং তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কীভাবে সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যায় তার সম্ভাব্য সমাধান খোঁজার জন্য অনুরোধ করা হয়। এই প্রশ্নমালাসহ এই গবেষণার গবেষকবৃন্দ ও সিপিজে'র প্রতিনিধি দল ১৯ জুন থেকে শুরু করে ২৭ আগস্ট' ২০২৩ পর্যন্ত চট্টগ্রাম, বান্দরবান, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা এবং ঢাকা - বাংলাদেশের ৯টি জেলা সফর করেন। এই সময়ের মধ্যে একশনএইডের সহায়তায় সিপিজের গবেষণা দলটি ১৭টি এফজিডি এবং ৭টি আইডিআই আয়োজন করে যেখানে ১১৪টি সিএসও'র প্রতিনিধিত্বকারী ১৩৫ জন অংশ নেন। এর মধ্যে অন্তত ২৩টি সিএসও'র কোনো ধরনের নিবন্ধন ছিল না। কিছু সিএসও বাংলাদেশ সরকারের একাধিক অধিদপ্তর এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে নিবন্ধিত ছিল এবং মাত্র কয়েকটি এনজিও হিসেবে নিবন্ধিত ছিল। এসকল সিএসও সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের জন্য শিশু অধিকার, যুব উন্নয়ন, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, প্রান্তিক দুঃস্থ মানুষ, লিঙ্গ সমতা ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, নারী অধিকার, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের অধিকার, মানবাধিকার ও উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ, পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। সবগুলো এফজিডি এবং আইডিআই বাংলা ভাষায় আয়োজন করা হয়। সাক্ষাৎকারের শুরুতে গবেষক দল এই গবেষণার বিষয়সমূহ নিয়ে মৌখিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করে। এরপর সাক্ষাৎকারদাতাদের এ সংক্রান্ত সকল তথ্য সম্বলিত একটি ফর্ম দেয়া হয়। সাক্ষাৎকারদাতাদের একটি সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর নেওয়া হয়, যা তাদের তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং নিজের পরিচয় প্রকাশ না করেই সাক্ষাৎকারদাতাদের এই গবেষণায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। সকল সাক্ষাৎকারদাতাই নাম প্রকাশ না করে তাদের বক্তব্য দিতে আগ্রহী হয়। মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কাজ শেষে, গবেষক দল সবগুলো সাক্ষাৎকারের প্রতিলিপি তৈরি করে। এই গবেষণার গবেষণা সংক্রান্ত নৈতিক এবং বাস্তবায়নের পুরো সময়জুড়েই একটি আদর্শ গবেষণা কার্যক্রমের সকল নীতিমালা এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি করা গবেষণা সংক্রান্ত নৈতিক নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

এই গবেষণায় অংশ নেয়া সিএসও প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে (পারপোসিভ স্যাম্পলিং) বাছাই করা হয়। সময় এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও প্রকল্পের বাধ্যবাধকতার কারণে বাংলাদেশের সকল জেলায় এই গবেষণা কার্যক্রম

পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া, সরকারি পর্যায়ের কোনো কোনো কর্মকর্তা শুরুতে সাক্ষাৎকার দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেও, সময় স্বল্পতা এবং অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে শেষ পর্যন্ত তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যে প্রক্রিয়ায় এই গবেষণায় অংশ নেয়া সিএসও প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকারের জন্য বাছাই করা হয়েছে তা অনিচ্ছাকৃত পক্ষপাত এবং কিছু মাত্রায় প্রতিনিধিত্বহীনতার দোষে দুষ্ট। গবেষণার ধরনের কারণে এফজিডি এবং আইডিআইতে অংশগ্রহণকারীদের দেয়া তথ্যগত দাবিসমূহ স্বাধীনভাবে যাচাই করাও অসম্ভব ছিল। তবে, মাঠ পর্যায়ের কাজের সময় যখন আমরা ১১৪টি সিএসও'র ১৩৫ জন প্রতিনিধির সাথে কথা বলেছি এবং পরবর্তীতে তার প্রতিলিপি তৈরি করে তা বিশ্লেষণ করেছি, তখন এটি পরিস্কার হয়ে যায় যে, আমরা আমাদের তথ্য সংগ্রহের বেলায় তথ্য স্যাচুরেশন অর্জন করেছিলাম। তাই আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ ও বাধা এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো খুবই মূল্যবান। আমরা আশা করি বাংলাদেশের সিএসও কমিউনিটি ও সরকার অবশ্যই এই গবেষণায় চিহ্নিত চ্যালেঞ্জ ও বাধাগুলোকে গুরুত্বের সাথে নেবে।

অধ্যায় ২: তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে বাধাসমূহ

বহুমুখী চ্যালেঞ্জের কারণে বাংলাদেশে সিএসওর জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি প্রক্রিয়াটি বাধাগ্রস্ত হয়। এসব চ্যালেঞ্জ মূলত বাংলাদেশ সরকার ও সিএসও এবং তৃণমূল সিএসও'র সাথে বড় এনজিও'র মধ্যে পারস্পরিক আস্থাহীনতার সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া, স্বাধীনভাবে কাজ করার চেষ্টা করলে সিএসও যে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির শিকার হয়, নিবন্ধন করার মাধ্যমে সিএসওদের স্বাধীনতা খর্ব হওয়া এবং যখন কোনো সিএসও তাদের সংগঠনকে নিবন্ধন করার চেষ্টা করে এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করে তখন দুর্নীতি এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ যে অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় ইত্যাদি বিষয়ের সাথেও এসব চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত।

আস্থাহীনতা এবং স্বাধীনভাবে চলতে গিয়ে তৃনমূল সিএসও'র অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া

সিএসও'রা এমন সব ধরণের কাজ করেন যেখানে সমাজের বিভিন্ন মানুষের ঐক্যবদ্ধ সহায়তা প্রয়োজন হয়, যা খুব সহজে পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেসব সিএসও প্রতিনিধি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রচারণা চালান, তাদেরকে সমাজের একটি বড় অংশের মানুষের কাছ থেকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, যাদের অনেকেই এলাকার মান্যগণ্য ব্যক্তি এমনকি স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিও। সাক্ষাৎকারদাতারা আমাদের জানান যে তারা এই কাজটির গুরুত্ব কমিয়ে দেয় এমন অসংখ্য প্রশ্ন এবং বাধার মোকাবিলা করেছেন।[৪] কিছু মানুষ তাদেরকে যেমন প্রশ্ন করে, "একটি মেয়ে শিশুর বাল্যবিবাহ হলে আপনার সমস্যা কী? আপনি কি তার অভিভাবক?"[৫] সামাজিক সহায়তা না পেলে সিএসও'রা অনেক সময়ই তাদের কাজের অনুমোদনের জন্য পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মতো স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের কাছে ছুটে যান। সিএসও'র প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য কেন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের অনুমোদন প্রয়োজন তা একজন সাক্ষাৎকারদাতা বর্ণনা করেন। "যখন একজন ওয়ার্ড কাউন্সিলর দায়িত্বে থাকেন, তিনি সহজেই একটি আনুষ্ঠানিক আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করতে পারেন যা এই কাজটি বাস্তবায়নে সহায়তা করে। তিনি চাইলে এই প্রকল্পকে সহায়তা করার জন্য রিকশায় মাইক লাগিয়ে প্রকাশ্য ঘোষণাও দিতে পারেন।"[৬] তবে, বাস্তবিক অর্থে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সহায়তা পাওয়া অনেক সময়ই খুব কঠিন হয়, যা কিনা সরকার, এনজিও অথবা সিএসও এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের পারস্পরিক আস্থাহীনতারই প্রতিফলন। অনেক সাক্ষাৎকারদাতাই এই আস্থাহীনতার বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলেছেন। আমাদের প্রথম দিকের একটি এফজিডিতে, ঢাকার

[৪] এফজিডি ০৩, ২১ জুন'২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ১১, ২৯ জুলাই'২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল;

[৫] এফজিডি ০২, ২০ জুন'২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল

[৬] এফজিডি ০২, ২০ জুন'২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল

বাইরে প্রতিষ্ঠিত একটি তৃণমূল সিএসও'র নারী প্রতিষ্ঠাতা, যিনি কিনা একটি বড় এনজিও'কে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সহায়তা করেছেন, তিনি একজন কাউন্সিলরের সাথে তার কথোপকথন বর্ণনা করেন। একটি খেলার মাঠ থেকে বর্জ্য অপসারণের বিষয়ে তার প্রস্তাব শোনার পর ওই কাউন্সিলরের প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, "এনজিও তো মানুষের টাকা খেয়ে ফেলে"।

কী কারণে এনজিও/সিএসও এবং সরকারের মধ্যে আস্থাহীনতা রয়েছে সে বিষয়ে জানতে চাইলে একটি এনজিও'র প্রতিষ্ঠাতা তাঁর সংগঠনের ভ্যাট এবং ট্যাক্স দেয়ার বাধ্যবাধকতা প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন,

> সামাজিক কর্মকাণ্ড এমন একটি বিষয় যা সরকার এককভাবে করতে পারে না। সরকারকে সহযোগিতা নিতে হয়। সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে আমি সরকারকে সহযোগিতা করছি। তবে, যেহেতু আমার সংগঠনের একটি ভাড়া নেওয়া কার্যালয় রয়েছে, তাই আমাকে ভ্যাট ও ট্যাক্স দিতেই হয়। মসজিদ এবং মাদ্রাসা ভ্যাট ও ট্যাক্সের আওতামুক্ত হলেও আমরা নই। এমন পরিস্থিতিতে আমি কেন সরকারকে সহায়তা করতে চাইবো?[৭]

সরকার কেন সিএসও এবং এনজিও'কে পুরোপুরিভাবে আস্থায় নিতে পারছে না সে বিষয়ে তার কাছে আরো জানতে চাওয়া হয়। তিনি হাসিমুখে বলেন, "আস্থার সংকট, নিজের আত্মবিশ্বাসের সংকট, বিশ্বাসের সংকট"।[৮] সরকারি সংস্থাগুলোকে কঠিন সমালোচনা করে তিনি আরো বলেন, "যারা জানে যে জনগণ তাদেরকে বিশ্বাস করে না, তারা অন্যদেরকেও অবিশ্বাস করে।"[৯] আমাদের সাক্ষাৎকারদাতা আরো যোগ করেন যে, ২০০১ সালের পর থেকে এনজিও ও সিএসওদের রাজনীতিকরণ ঘটে। এর ফলে বিভিন্ন এনজিও এবং সিএসও'র রাজনীতিকরণের হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ফলে বিভিন্ন সময়ের সরকার এবং এনজিও/সিএসও'দের মধ্যে আস্থাহীনতা বেড়ে যায়।[১০] তিনি পরামর্শ দেন যে, এজন্যই এনজিওগুলোর উচিত সামাজিক কর্মকাণ্ডে সরকারের নেওয়া উদ্যোগের সাথে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। অন্যদিকে, এনজিও হিসেবে নিবন্ধিত না হওয়া সিএসওদের উচিৎ প্রেশার গ্রুপ হিসেবে সমাজের নানা সংকটকে চিহ্নিত করা।[১১] আমাদের সাক্ষাৎকারদাতা বিশ্বাস করেন যে, এটি তখনই সম্ভব যখন সিএসওগুলো তাদের কার্যক্রমের লক্ষ্য ও তাদের স্বাধীন সত্ত্বা সম্পর্কে সচেতন থাকবে এবং প্রয়োজনে সরকারি সংস্থা ও অধিদপ্তরের সাথে নিবন্ধিত হওয়া থেকে বিরত থাকবে।

এই আস্থাহীনতা বড় এনজিও এবং তৃণমূল পর্যায়ের সিএসও'র মধ্যে দেখা যায়। মাঠ পর্যায়ের অনেক সাক্ষাৎকারদাতাই দাবি করেছেন যে, এনজিওগুলো তাদের তহবিলের টাকা জলের মতো খরচ করে এবং তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের সাথে কাজ করার সময় শোষণমূলক আচরণ করে। এধরনের আচরণ এনজিও এবং সিএসও'র মধ্যে ব্যবধান আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। "আপনি দেখবেন, ছোট সিএসওগুলো প্রতিষ্ঠিত হোক সেটা বড়

---

[৭] আইডিআই ০২, জুন ০২, ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; প্রসঙ্গত বলা যায়, ন্যাশনাল ব্যুরো অফ রেভিনিউ (এনবিআর) কর্তৃক ছাড় না পেলে বাংলাদেশে নিবন্ধিত সিএসওগুলো যেকোন পণ্য বা সেবা গ্রহণের জন্য ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট দিতে আইনগতভাবে বাধ্য। তাদের বার্ষিক অডিট জমা দেয়ার সময় ভ্যাটের রশিদও জমা দিতে হয়। শুধু তাই নয়, যখন তারা কর্পোরেট আয়কর থেকে অব্যাহতি পায় তখনও তাদেরকে কর এবং ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিতে হয়। আমাদের সাক্ষাৎকারদাতার মতে, এসব বাধ্যবাধকতার ফলে সিএসও বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওগুলো বড় ধরনের অসুবিধায় পড়ে। আরো দেখুন, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর নট-ফর-প্রফিট ল (২০১৯), লিগ্যাল ম্যানুয়াল ফর সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনস ইন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা-৫, https://www.icnl.org/wp-content/uploads/12.2019-Bangladesh-Operational-Guide-ENvf-digital.pdf

[৮] আইডিআই ০২, জুন ০২, ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল

[৯] আইডিআই ০২, জুন ০২, ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল

[১০] এফজিডি ০১, ১৯ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এবং এফজিডি ০৯, ২৬ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল

[১১] এফজিডি ০১, ১৯ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল

এনজিওগুলো চায় না"– এমন দাবি করেন একজন সাক্ষাৎকারদাতা।[১২] আরেকজন সাক্ষাৎকারদাতা দাবি করেন যে, বড় এনজিওগুলো তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওগুলোকে তাদের তহবিল সংগ্রহের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।[১৩]

মাঠ পর্যায়ে গবেষণাকালীন আলোচনা যত বেশি এগিয়েছে, আমরা ততো বেশি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, জনগণের অধিকার নিয়ে কাজ করা কোনো সিএসও স্বাধীনভাবে কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গেলে প্রায়শই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে কর্মরত একটি সিএসও'র একজন সাক্ষাৎকাদাতা এ বিষয়ে আলোকপাত করেন। ওই ব্যক্তি দাবি করেন যে, গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এসব সংগঠনের সদস্যদের নিয়মিত নজরদারির আওতায় রাখে। তিনি আমাদের বলেন, "তারা আমাদের মিছিলে অংশগ্রহণ করা মানুষের ছবি নেয় এবং আমাদের বক্তব্য রেকর্ড করে [...] তাদের এসব কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয় আমরা যেন কোনো অপরাধ করছি।"[১৪]

নিবন্ধনের মাধ্যমে তৃণমূল সিএসওদের স্বাধীন সত্ত্বা বাধাগ্রস্ত হওয়া

গবেষণাকালে আমরা সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যেমন সমাজসেবা অধিদপ্তর (ডিএসএস), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (ডিডব্লিউএ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (ডিওয়াইডি), ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (এমআরএ) এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (এনজিওএবি) ইত্যাদি ও নিবন্ধনের আওতার বাইরে থাকা বহু তৃণমূল পর্যায়ের সিএসও'র প্রতিনিধির সাথে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ পেয়েছি। এসব সিএসও'র কয়েকটি অধিকারভিত্তিক, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক কাজে জড়িত ছিল। যখন আমরা জিজ্ঞেস করেছি যে, কেন তারা 'অনিবন্ধিত' থাকতে চেয়েছে, তখন একজন সাক্ষাৎকারদাতা বলেন,

> নিবন্ধনের সাথে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু অলিখিত শর্ত দেয়া হয়। যখন আমাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় তখন আমাদেরকে রাস্তায় নামতে হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। যদি নিবন্ধিত হই, তাহলে আমরা কী করতে পারবো এবং কী পারবো না এমন অনেক শর্তই আরোপ করা হয়। তখন আমরা সব বিষয়ে কথা বলা বা অবস্থান নিতে পারি না। আমাদের মাঝেমধ্যেই সরকারের সমালোচনাও করতে হতে পারে, যা আমরা নিবন্ধিত হলে করতে পারবো না। এজন্যই নিবন্ধনের চিন্তা কখনোই আমাদের মাথায় আসে না।[১৫]

তিনি বিশ্বাস করেন যে, নিবন্ধিত হওয়া মানে এক ধরণের সরকারি বাধনে আটকে যাওয়া। তিনি বলেন যে তার সংগঠন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পছন্দ করে। একজন সাক্ষাৎকারদাতা দাবি করেন যে, "সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা নিবন্ধিত সিএসওগুলোকে তাদের অধীনস্ত মনে করেন এবং এজন্যই তারা এধরনের সিএসও'দের সঙ্গে কর্তৃত্ববাদী আচরণ করেন।" [১৬] অনেক সাক্ষাৎকারদাতাই এসব বক্তব্যকে সমর্থন করেন।[১৭] আদিবাসী জনগোষ্ঠীর

---

[১২] এফজিডি ০৯, ২৬ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল

[১৩] এফজিডি ১৪, ৩১ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল

[১৪] আইডিআই ০৩, ২০ জুন, ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; যেসব আইনগত বিধান আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের এমন কর্মকাণ্ড করতে সহায়তা করে সেগুলো আরো একবার পড়ে নেয়া জরুরি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০১৮) এর ২৬ নম্বর ধারাকে আরো একবার ভালো করে নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

[১৫] এফজিডি ১৬, ০১ আগস্ট ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল। বাংলাদেশ সরকারের আরোপিত এসব অলিখিত শর্তসমূহ বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ৭, ৩৮ ও ৩৯ এর মতো অনেক বিধানকেই সরাসরি অমান্য করে।

[১৬] এফজিডি ০১, ১৯ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[১৭] এফজিডি ০৮, ২৪ জুলাই ২০২৩; এফজিডি ০৯, ২৬ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ১০, ২৬ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ১৩, ৩১ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ১৪, ৩১ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল

অধিকার নিয়ে কর্মরত একটি সিএসও'র নেতৃস্থানীয়, এমন একজন সাক্ষাৎকারদাতা বলেন, "যদি নিবন্ধনের কারণে আমরা আমাদের বক্তব্যকে কার্যকরভাবে উপস্থাপন করতে না পারি, তাহলে আমাদের সংগঠনের নিবন্ধিত হওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই।"[১৮] আরেকজন সাক্ষাৎকারদাতা গর্বের সাথে বলেন যে, তিনি সবসময়ই অধিকার-ভিত্তিক কাজের সাথে যুক্ত সিএসওগুলোকে সরকারি সংস্থার সাথে নিবন্ধন না করার পরামর্শ দেন। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, "অধিকার বিষয়ক আন্দোলন স্বভাবগত দিক থেকেই সরকার বিরোধী। যখন আপনি সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেন, তখন তারা আপনার উপর শর্ত আরোপ করার চেষ্টা করবে।"[১৯] তিনি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন যেখানে কারাগারে বন্দি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা একজন ব্যক্তির জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার সময় সরকারের সাথে নিবন্ধিত একটি অধিকার-ভিত্তিক সিএসও বা এনজিও সাহায্যের হাত এগিয়ে দেয়নি। তিনি বলেন,

> যদি বাংলাদেশে অধিকার-ভিত্তিক সংগঠনগুলো কোনো কিছু অর্জন করতে চায়, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই ঝুঁকি নিতে শিখতে হবে। শান্তি এমন একটি জিনিস যা কখনো নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আপনাকে অবশ্যই শান্তির জন্য লড়াই করতে হবে। এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করতে হলে আপনার প্রতিবাদী মনোভাব থাকতে হবে। আর এই ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের প্রগতিশীল মানুষের সমর্থন আমাদের প্রয়োজন হয়। আমি এটা বলছি না যে, আমরা এনজিওগুলোকে এড়িয়ে যাবো। এনজিও'র উপযোগিতা অস্বীকার করার মাধ্যমে কোনো ফায়দা হবে না। এনজিও আলোচনা সৃষ্টি করে। তারা তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল এবং সিদ্ধান্ত সবার সাথে বিনিময় করে, যা কিনা শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সহায়তা করে। বেসামরিক এবং পুলিশ প্রশাসন অনেকবারই আমাকে ম্যানেজ করা বা মানানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু, যেহেতু আমার সংগঠন নিবন্ধিত নয় তাই তারা সফল হতে পারেনি। অনিবন্ধিত হওয়া আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছে।[২০]

কিছু সিএসও'র প্রতিনিধি অবশ্য ভুলভাবে বিশ্বাস করেন যে, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার আওতায় নিবন্ধিত হওয়াটা তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার আইনগত পূর্বশর্ত।[২১] অবশ্য অনেক সিএসও'র প্রতিনিধি নিবন্ধিত না হয়ে নিজেদের স্বাধীন সত্ত্বাকে বজায় রাখার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করলেও, আমরা তৃণমূল সিএসও প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে এমন মতামতও পেয়েছি যারা সচেতনভাবে নিবন্ধিত হওয়ার পক্ষে কথা বলেন। আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে সাক্ষাৎকারদাতারা সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধিত হওয়ার সুবিধাগুলো তুলে ধরেন। নিবন্ধিত হলে সরকার এবং বৃহত্তর এনজিওগুলোর সাথে একযোগে কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়।[২২] নিবন্ধন এটিও নিশ্চিত করে যে, তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের একটি পরিচিতিমূলক কাঠামো রয়েছে যা কিনা তাদের সংস্থাকে স্থিতিশীল করে। একজন সাক্ষাৎকারদাতার মতে,

> গঠনতন্ত্র থাকাটা নিবন্ধন লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত এবং এটি নিশ্চিত করে যে, আমাদের সংগঠনের নির্দিষ্ট কাঠামো রয়েছে এবং আমরা কিছু আইন মানতে বাধ্য। আমাদের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও'র) কার্যালয়ে একটি মাসিক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করতে হয়, যেখানে আমরা সভায় উপস্থিত এনজিও'র প্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এবং আমাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা তুলে ধরি।[২৩]

---

[১৮] আইডিআই ০৩, ২০ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।
[১৯] এফজিডি ১৬, ০১ আগস্ট ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।
[২০] এফজিডি ১৬, ০১ আগস্ট ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।
[২১] এফজিডি ১৩, ৩১ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।
[২২] এফজিডি ০৩, ২১ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ০৪, ২২ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।
[২৩] এফজিডি ১৬, ০১ আগস্ট ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধন এসব সংস্থার কাছ থেকে আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির বিষয়টিও নিশ্চিত করে, যা কিনা তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়ক হয়।[২৪] কোনো সিএসও যদি বৈদেশিক অনুদান পেতে চায়, তাহলে সেটিকে অবশ্যই এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (এনজিওএবি)-এর আওতায় এনজিও হিসেবে নিবন্ধিত হতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার আওতায় আগে নিবন্ধিত হওয়ার বিষয়টি তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওগুলোকে এনজিও'র স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।[২৫] একজন সাক্ষাৎকারদাতা ব্যাখ্যা দেন যে, "যখন আমরা এনজিও হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কাছে আবেদন করি, তখন তারা আমাদের অতীতের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে চায়। আমরা যখন বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সাথে আমাদের নিবন্ধিত হওয়া এবং নির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র মেনে কাজ করার বিষয়টি উল্লেখ করি, তখন এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে।"[২৬] তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এফজিডি এবং আইডিআইতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একটি বিষয়ে আমরা ঐক্যমত দেখতে পাই যে, নিবন্ধনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং নিবন্ধন পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলো নানা ধরনের সীমাবদ্ধতায় জর্জরিত।

নিবন্ধন এবং পরবর্তী সময়ে সিএসওদের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার চিত্র

সময়ের সাথে সাথে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার আওতায় সিএসওদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া যেমন আরো বেশি সুবিন্যস্ত হয়েছে, তেমনই এগুলো বাস্তবিক অর্থে অনেক ক্ষেত্রে বেশি কঠোর, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অস্বচ্ছ হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সমাজসেবা বিষয়ক অধিদপ্তর (ডিএসএস)-এর সাথে নিবন্ধনে ইচ্ছুক অথবা নিবন্ধিত হওয়া সিএসওদের কিছু শর্ত পূরণ করতে হয় যেমন- সংগঠনের নামে থাকা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির মালিকানা প্রমাণ করা; দু'টি আলাদা কমিটির অস্তিত্ব প্রমাণ করা ইত্যাদি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বহু বছর ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা প্রমাণও দেখাতে হয়। সাক্ষাৎকারদাতারা অভিযোগ করেন যে, সমাজসেবা বিষয়ক অধিদপ্তর (ডিএসএস)-এর নির্ধারিত শর্তগুলো অনেক বেশিই কঠিন। এসব কঠোর এবং জটিল শর্তের জন্য তৃণমূল পর্যায়ের অনেক সিএসওই ভুক্তভোগী হয়েছে কেননা, এসব আবেদন পূরণ করার মতো দক্ষতা বা জনবল তাদের নেই।[২৭] অনেক সাক্ষাৎকারদাতা অভিযোগ করেন যে, সমাজসেবা বিষয়ক অধিদপ্তর (ডিএসএস)-এর আওতায় নিবন্ধিত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি অনেকাংশেই দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার সাথে সংশ্লিষ্ট সিএসও'র সম্পর্কের উপর নির্ভর করে।[২৮] ভালো সম্পর্ক এবং সঠিক ভাবমূর্তি থাকলে খুব বেশি ভোগান্তি ছাড়াই নিবন্ধন করা সম্ভব হয়। এমন পরিস্থিতিতে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনেক সময় নিবন্ধনের আবেদন করা সিএসও'কে তাদের সীমাবদ্ধতা দূর করা এবং পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নিজে থেকেই সহায়তা করেন।[২৯] বিপরীতদিকে, সম্পর্ক ভালো না থাকলে নিবন্ধনের সময় অনেক রকমের হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়।[৩০] সাক্ষাৎকারে অংশ নেয়া অনেকেই একটি অসম পরিবেশের কথা তুলে ধরে যেখানে সরকারি সংস্থাগুলো এনজিও এবং বড় পরিসরে কাজ করা সিএসওগুলোকে তৃণমূল পর্যায়ের সিএসও'র তুলনায় অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা দেয়।

অনেক সাক্ষাৎকারদাতা অভিযোগ করেছেন যে, ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তথাকথিত ভাবমূর্তি ছাড়াও ঘুষ দেয়ার মাধ্যমে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর হয়। আমাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করে এই অভিযোগটির সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। আমাদের মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কাজ চলাকালীন সময়, অধিকাংশ

[২৪] এফজিডি ১৬, ০১ আগস্ট ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[২৫] আইডিআই ০১, ২০ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ১৩, ৩১ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[২৬] এফজিডি ১৬, ০১ আগস্ট ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[২৭] এফজিডি ০৭, ২৪ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ১২, ২৯ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল

[২৮] আইডিআই ০১, ২০ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ১৪, ৩১ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ১৬, ০১ আগস্ট ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[২৯] এফজিডি ১৬, ০১ আগস্ট ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল

[৩০] এফজিডি ১৬, ০১ আগস্ট ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

সাক্ষাৎকারদাতাই অভিযোগ করেন যে, নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর করা এমনকি নিবন্ধন প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সরকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে ঘুষ দাবি করাটা একটি স্বাভাবিক বিষয়।[৩১] একজন সাক্ষাৎকারদাতা বলেন, "টাকা পয়সা ছাড়া রেজিস্ট্রেশন তো মেলেই না"।[৩২] মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (ডিডব্লিউএ)-এ বহু বছর আগে নিবন্ধিত, নারীদের দ্বারা পরিচালিত একটি সিএসও'র একজন নারী সাক্ষাৎকারদাতা দাবি করেন যে, ঘুষ নেয়ার সমস্যাটা দিনে দিনে আরো প্রকট হয়েছে এবং তারা যখন নিবন্ধন করেছিলেন, তখন তাদেরকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। তিনি বলেন, "আমরা যখন নিবন্ধন করি, তখন পুরো প্রক্রিয়াটি অনেক সহজ ছিল। তবে, তৃণমূল পর্যায়ে সিএসওগুলো যখন সরকারি কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হয়, তখন তাদের খুব বেশি তর্ক করার সুযোগ থাকে না এবং সরকারি কর্মকর্তারা এর ফায়দা নেন।"[৩৩] এফজিডি চলাকালীন সময়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের অধিকার নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে এমন একটি সিএসও'র প্রতিনিধির সাথে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করি। সাক্ষাৎকারদাতা নিজেও একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। নিবন্ধন পাওয়ার জন্য কীভাবে তিনি মাসের পর মাস সরকারের একটি বিভাগ থেকে আরেকটি বিভাগে ঘুরেছেন সে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।[৩৪] তিনি দাবি করেন, শেষ পর্যন্ত ঘুষ দেয়ার পরই তার সিএসও নিবন্ধিত হয়। অনেকেই দাবী করেন যে প্রতিষ্ঠিত এনজিওগুলো তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওগুলোকে নিবন্ধনের সময় সাহায্য করলে এই সমস্যা খুব সহজেই সমাধান করা সম্ভব। তবে সাক্ষাৎকারদাতারা আরো বলেন যে, এ ধরনের সহায়তা এখন খুবই বিরল ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে কেননা, বর্তমানে বড় এনজিওগুলো তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের সাথে একসাথে কোনো কাজ করতে আর আগ্রহ দেখায় না।[৩৫]

নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির জন্য শুধু সরকার, তৃণমূল সিএসও এবং বড় এনজিওগুলোর মধ্যকার অসম সম্পর্ককেই দায়ী করা যাবে না। অনেক সাক্ষাৎকারদাতার মতে, সিএসও হিসেবে দাবি করেও সমাজসেবা না করে বরং বাণিজ্যিক চিন্তাধারা পোষণ করা সংগঠনের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। তারা বলেন যে, শুধু তহবিল পাওয়ার জন্যই সরকারের নিবন্ধন চায়, এমন সংগঠনের বিস্তারও ঘুষের সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করতে ভূমিকা রেখেছে। সাক্ষাৎকারদাতারা বিশ্বাস করেন যে, বিভিন্ন সরকারি সংস্থার কর্মকর্তারা এই বাস্তবতা সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত এবং এজন্যই সিএসও হিসেবে দাবি করা সংগঠনগুলোর কাছে ঘুষ দাবি করাও তাদের জন্য সহজ হয়েছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই ঘুষের সংস্কৃতি নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে ছাপিয়ে অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকারি কোনো সংস্থার আওতায় নিবন্ধিত হলে সিএসওদের পক্ষে মূলধন এবং অনুদান পাওয়া সহজ হয়। অনেক সাক্ষাৎকারদাতার মতে, অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষ দেয়াটা প্রায় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, সরকারি কর্মকর্তা বিশেষ করে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য, তাদের নিজস্ব অনুষ্ঠান এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওগুলোকেও টাকা দিতে হয়।[৩৬] নিবন্ধিত সিএসও'র অনেক প্রতিনিধির মতে, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এমনকি কিছু মন্ত্রণালয়ও সিএসওগুলোকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে এবং সেজন্য সিএসওদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে। ওয়ার্ড কাউন্সিলররাও সিএসও'র মাধ্যমে না করে তাদের রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মাধ্যমেই সামাজিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করতে বেশি

---

[৩১] এফজিডি ০৫, ২৩ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ০৭, ২৪ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ১২, ২৯ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ১৩, ৩১ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৩২] এফজিডি ১৩, ৩১ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল। যেহেতু বেশিরভাগ সাক্ষাৎকারদাতাই নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন তাই বিষয়টিকে দুর্নীতি দমন কমিশন, দুদক-এর নজরে আনা উচিত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (অ্যান্টি করাপশন কমিশন অ্যাক্ট ২০০৪) এর ১৯ ধারা মোতাবেক দুদক দুর্নীতির বিষয়ে অনুসন্ধান করার বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

[৩৩] এফজিডি ১৩, ৩১ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৩৪] এফজিডি ১৪, ৩১ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৩৫] এফজিডি ০৯, ২৬ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ১০, ২৬ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৩৬] এফজিডি ০১, ২০ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য কর্মরত একটি সিএসও'র একজন সাক্ষাৎকারদাতা অভিযোগ করেন যে, ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তারা অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত এমন সিএসওগুলোকে বেশি সহায়তা দিতে আগ্রহী।[৩৭]

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, অরাজনৈতিক বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ছাড়া অন্যান্য সংগঠনের মধ্যেও রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কাজের সময় আমরা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সম্পর্কিত বিষয়, যেমন- সুস্বাস্থ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাজ এবং অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো সমস্যা নিয়ে কর্মরত একটি তৃণমূল পর্যায়ের সিএসও'র প্রতিনিধির সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। গত বছর এই সংগঠনটি রান্নাঘরের বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরি করার একটি প্রকল্পের জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতা করে অনুদান লাভ করে। এবছরের শুরুতে ওই সংগঠন তাদের 'পণ্য' অর্থাৎ পরিবেশবান্ধব সার বাজারে আনে। সেদিনের কাজ শেষে হোটেলে ফেরার পর আমরা গুগল সার্চ করে দেখতে পাই যে, ওই সিএসওটি একটি শীর্ষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খুবই সক্রিয়। আমরা আরো জানতে পারি যে, বাংলাদেশ সরকারের কাছে কাজ করে এমন একটি বড় মাপের অলাভজনক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন ধরনের সংস্থা থেকেও এই সিএসওটি আর্থিক সহায়তা করেছে।

সুবিধাপ্রাপ্ত বড় সিএসও'র প্রতিনিধিরাও ভিন্নধর্মী এবং সুখকর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশি ও বিদেশি শিক্ষার্থী রয়েছে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্কিত এবং অধ্যাপকদের সহায়তাপ্রাপ্ত একটি সিএসও'র প্রতিনিধিত্বকারী একজন সাক্ষাৎকারদাতা বলেন, কাউন্সিলরদের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে তাদের সংগঠনের কোনো সমস্যারই সম্মুখীন হতে হয়নি। ঢাকায় সদর দপ্তর রয়েছে এমন একটি সিএসও'র হয়ে কাজ করার সময় সেই একই সাক্ষাৎকারদাতা অনেকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া কেন প্রয়োজনীয়। তিনি দাবি করেন, তার সংগঠন নিজেদের সদস্যদের এটি শিখিয়েছে যে, মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করার সময় সরকারের অনুমতি নেয়াটা পূর্বশর্ত নয়। এই সাক্ষাৎকারদাতা শিশু নির্যাতন, মাসিক এবং নারীস্বাস্থ্য বিষয়ক যে তিনটি প্রকল্পে তিনি যুক্ত ছিলেন তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি জানান, ওইসব প্রকল্প সরকারের তথাকথিত অনুমতি ছাড়াই সফলভাবে বাস্তবায়ন হয়েছিল।

এনজিও হিসেবে নিবন্ধিত সিএসওদেরও নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এসব সমস্যার বেশিরভাগই মূল্যায়নকারী সরকারি সংস্থাগুলোর দুর্নীতি, অযোগ্যতা এবং পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত।[৩৮] একটি এনজিও'র প্রতিনিধি দাবি করেন যে, শুধু এনজিও বিষয়ক ব্যুরো-এর কর্মকর্তাদেরকে ঘুষ দিতে রাজি না হওয়ার জন্য তার সংগঠনের নিবন্ধন বেশ কয়েক বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।[৩৯] অনেক সময় কিছু এনজিওর নিবন্ধন দেয়া হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের আবেদনে এটি উল্লেখ করা হয় যে তাদের প্রাপ্ত বিদেশি অনুদানের একটি অংশ জনগণের জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যয় করা হবে।[৪০] নিবন্ধনের আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কাজে অনেক সময়ই এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নানা গাফিলতির প্রমাণ দেখা দেয়। একটি এনজিও'র প্রতিনিধি দাবি করেন যে, তাদের আবেদনের সাথে জমা দেয়া দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হারিয়ে ফেলেছিল। তিনি বলেন, "এসব নথি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কাছে এর কোনই মূল্য নেই।"[৪১] এনজিও নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় একটি বড় সমস্যা হলো, স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি), জেলা প্রশাসন এবং জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)-এর ছাড়পত্র পাওয়া, কেননা এসব সংস্থার প্রতিনিধিরা মাঝেমধ্যেই ঘুষ

[৩৭] এফজিডি ০১, ২০ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৩৮] এফজিডি ০৫, ২৩ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ০৬, ২৩ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ০৭, ২৪ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৩৯] এফজিডি ০৫, ২৩ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৪০] এফজিডি ০৫, ২৩ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৪১] আইডিআই ০১, ২০ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

দাবি করার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং সরকার পরিবর্তনের সাথেই তাদের রাজনৈতিক আনুগত্যও পরিবর্তিত হয়।[৪২] বিরোধী দলের সাথে যুক্ত একজন সাক্ষাৎকারদাতা বলেন, এসব প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে।[৪৩] তার রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কারণে কীভাবে তার সংগঠন প্রাথমিকভাবে এনএসআই-এর ছাড়পত্র পেতে ব্যর্থ হয়েছিল সেই ঘটনা বর্ণনা করে তিনি পুরো প্রক্রিয়াটিকেই 'বিকৃত' হিসেবে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, সেখানে ঘুষ দিতে হয়।[৪৪] তবে মাঠ পর্যায়ে গবেষণাকালে আমরা নিরাপত্তা ছাড়পত্র পেতে কোনো সমস্যাই হয়নি এমন এনজিও'র প্রতিনিধিদেরও সাক্ষাৎ পাই।[৪৫]

নিবন্ধন এবং এর পরবর্তী বিভিন্ন প্রক্রিয়া যেমন নিবন্ধন হালনাগাদ, অডিট এবং অনুদান পাওয়া ইত্যাদি সম্পন্ন করা অনেক কষ্টকর ও অস্বচ্ছ এবং প্রতিষ্ঠিত এনজিওগুলোর প্রতি পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (ডিওয়াইডি)-এর সাথে নিবন্ধিত একটি সিএসও প্রতিষ্ঠাতা জানান, নিবন্ধনের প্রাথমিক কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্যও তাকে বেশ কয়েকবার ওই সংস্থায় যেতে হয়েছে। তিনি জানান, "তারা যদি শুরুতেই আমাকে একটি নমুনাপত্র সরবরাহ করতো, তাহলে আমাকে এতোবার ওই বিভাগে যেতে হতো না।"[৪৬] একইভাবে বেশ কিছু সাক্ষাৎকারদাতা দাবি করেন যে, যথাসময়ে নিবন্ধন হালনাগাদ করতে গিয়েও তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, প্রক্রিয়া শেষ করতে অনেক সময় এক বছরও লেগে গিয়েছে। সিএসও'র প্রতিনিধিরা যদি জানেনও যে কী কী কাগজপত্র লাগবে এবং কখন হালনাগাদের কাজ শেষ করতে হবে, তারপরও তাদের আবেদনের সর্বশেষ তথ্য জানা এবং সেটি এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে নেয়ার জন্য তাদেরকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে বারবার যেতে হয়।[৪৭]

নিবন্ধিত হওয়ার মানে হলো একটি সিএসও বার্ষিক অডিট করতে বাধ্য। একজন সাক্ষাৎকারদাতার মতে, অনেক সময়ই এসব অডিট সংগঠনের ভাবমূর্তির উপর নির্ভর করে করা হয় এবং ঘুষের বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার দ্বারা অনুমোদিত হয়।[৪৮] একটি এনজিও'র প্রতিনিধি জানান যে, ছোট এনজিও এবং তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের তুলনায় আর্থিকভাবে বেশি স্বচ্ছল এনজিওগুলোতে সরকারি সংস্থায় যাতায়াত এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্ধারিত কর্মচারী নিয়োগ করে।[৪৯] এভাবে এটি নিশ্চিত করা হয় যে, এসব এনজিও'র প্রতি সরকারি দপ্তরগুলো অনুদান দেয়াসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ছোট পরিসরে কাজ করা সিএসও'র প্রতিনিধিত্ব করা সাক্ষাৎকারদাতারা জানান যে, বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তাদের কাছে মাঝেমধ্যেই ডেপুটি কমিশনার (ডিসি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও), স্থানীয় পুলিশ এমনকি রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র নিতে বলা হয়। আর এসব কাজ করতে গিয়ে তাদেরকে নানা ধরনের হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়।[৫০]

বড় এনজিও'র আর্থিক সক্ষমতা অনেক ছোট এনজিও এবং তৃণমূল পর্যায়ের সিএসও'র কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনেক তৃণমূল পর্যায়ের সিএসও'ই তাদের সদস্য এবং তাদের কাজের

[৪২] এফজিডি ০৬, ২৩ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ০৮, ২৪ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ১৭, ২৭ আগস্ট ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল

[৪৩] এফজিডি ১৬, ০১ আগস্ট ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৪৪] এফজিডি ১৬, ০১ আগস্ট ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৪৫] এফজিডি ১৭, ২৭ আগস্ট ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৪৬] এফজিডি ০২, ২০ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল। এই গবেষণা চালানোর সময় গবেষকরা নিবন্ধনের জন্য কী কী জিনিস লাগবে তার বর্ণনা দেয়া কোন নথির সন্ধানে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার ওয়েবসাইট খুঁজে দেখেছেন। এসব বিষয় সেখানে থাকলেও সেগুলো খুঁজে বের করা খুবই কঠিন।

[৪৭] এফজিডি ০৮, ২৪ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৪৮] এফজিডি ০৯, ২৬ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল

[৪৯] আইডিআই ০১, ২০ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৫০] এফজিডি ০১, ১৯ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ১৫, ০১ আগস্ট ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

প্রতি সহানুভূতিশীল শুভাকাঙ্খীদের দেয়া মাসিক অনুদানের টাকায় টিকে থাকে।[৫১] আমাদের বেশিরভাগ সাক্ষাৎকারদাতাই প্রায় ঐক্যবদ্ধ সুরে জানান যে, ছোট এনজিও এবং তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের ধারাবাহিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা হলো পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব। তহবিলের ঘাটতির কথা বলতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে (সিএইচটি) সক্রিয় একটি এনজিও'র নারী কর্মকর্তা বিষন্ন স্বরে বলেন, "অনেক এনজিও টিকে নেই, ঝরে গেছে।"[৫২] মূলত তহবিলের ভয়াবহ ঘাটতিই বহু তৃনমূল পর্যায়ের সিএসওগুলোকে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাধা দেয়। জেন্ডার ভিত্তির-বৈষম্যের শিকার হয়ে গৃহহীন মানুষকে আশ্রয় দেয় এমন একটি সিএসও'র প্রতিনিধিত্বকারী নারী সাক্ষাৎকারদাতা আমাদেরকে জানান যে, টাকার অভাবে একটি সারভাইভার সাপোর্ট সেন্টার করতে পারছেন না। এই দুঃখজনক বাস্তবতা আমাদেরকে বলার সময় তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন।[৫৩]

বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওগুলো যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে তার মধ্যে ধর্মীয়, লিঙ্গভিত্তিক এবং জাতিগত বিষয়ও জড়িত আছে। দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় একটি প্রতিষ্ঠিত এনজিও'র প্রতিষ্ঠাতা দাবি করেন যে, বহু বছর আগে তার সংগঠনকে বাংলাদেশ সরকারের একটি নির্দিষ্ট দপ্তরে নিবন্ধনের চেষ্টা করার সময়, তাকে অনানুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয় যে, নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় লাগবে কেননা তার সংগঠনের প্রধান ছিলেন ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘু একজন ব্যক্তি। এর ফলে শেষ পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে সহজ একটি নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দুই বছর সময় লেগে যায়। মাঠ পর্যায়ের কাজ করার সময় আমরা যুব উন্নয়ন বিষয়ে কাজ করে এবং বড় একটি এনজিও'র সহায়তা পেয়েছে এমন একটি নিবন্ধিত সিএসও'র তরুণ নারী প্রতিষ্ঠাতার সাথে পরিচিত হই। তিনি তার সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করার সময় পরিবার এবং অন্যান্য জায়গা থেকে আসা বহুবিধ চ্যালেঞ্জের কথা বর্ণনা করেন।[৫৪] এসব কর্মকাণ্ড তার পড়াশোনাকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে তা নিয়ে তার পরিবার চিন্তিত ছিল। আবার নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেও নিবন্ধন পেতে ব্যর্থ হয়েছিল এমন সব সংগঠনের প্রতিনিধি গুজব রটায় যে, তিনি অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে নিবন্ধন পেতে সফল হয়েছেন। কিছু তৃণমূল পর্যায়ের সিএসও জানিয়েছে যে, নিজেদের লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করার সময় তারা নারী কাউন্সিলরদের কাছে যেতে আগ্রহ বোধ করতেন না, কারণ এর ফলে পৌরসভার পুরুষ কাউন্সিলররা তাদের প্রতি আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন এবং কাজে বাধা দিতেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত সিএসও'র প্রতিনিধিদের সাথে কথোপকথনের সময় আমরা জানতে পারি যে, সিএসও, বিশেষ করে যেগুলো প্রান্তিক এলাকায় কাজ করে, তারা অনেক সময়ই সড়ক যোগাযোগ বা ইন্টারনেট সংযোগের মতো অবকাঠামোগত সুবিধার অভাবে সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সহায়তা ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে না।

তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের মাঝে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা

প্রতিটি এফজিডি এবং আইডিআই-এর শেষ পর্যায়ে আমরা সাক্ষাৎকারদাতাদেরকে তাদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে কথা বলতে অনুরোধ জানাই এবং এসময় আমরা তাঁদের কাছ থেকে বেশ কিছু অকপট স্বীকারোক্তি পাই। সাক্ষাৎকারদাতারা বলেন যে, বাংলাদেশে সিএসওগুলো ঐক্যবদ্ধ নয় এবং তাদের বিভিন্ন অভিযোগ জানানো এবং সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম নেই। অনৈক্যের পেছনে এনজিও হিসেবে নিবন্ধিত বৃহত্তর সিএসওদের ভূমিকা এবং তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের দুর্বলতা কিছুটা দায়ী। সাক্ষাৎকারদাতারা দাবি করেন যে, এধরনের সিএসওগুলো তাদের পরোপকার ও স্বেচ্ছাশ্রমের দর্শন থেকে দূরে সরে গেছে এবং লাভজনক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেগুলো কিনা সরাসরি মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে বেশি আগ্রহী এবং

[৫১] এফজিডি ০৩, ২১ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ০৪, ২২ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৫২] আইডিআই ০৪, ২১ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৫৩] এফজিডি ০৪, ২২ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৫৪] এফজিডি ০২, ২০ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদেরকে সহযোগিতা করার মধ্যে তারা তেমন কোনো লাভ দেখে না।[৫৫] বৃহত্তর এনজিও এবং সিএসওগুলো এই অবস্থার পরিবর্তন করতে তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি কারণ এখানে তারা নানা রকমের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে লাভবান হয়েছে, যেগুলো থেকে তৃণমূল পর্যায়ের সিএসও'রা বঞ্চিত। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকারের মতো রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর বিষয়ে বিদেশি অনুদান নেয়ার বিষয়টিও তারা এড়িয়ে যায়। আর্থিকভাবে সক্ষম কিছু বড় এনজিও এবং সিএসও বিভিন্ন কাজ হাসিল করার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দেয়ার মাধ্যমে দুর্নীতির সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করে। এই সংস্কৃতির সমালোচনা করে একজন সাক্ষাৎকারদাতা বলেন, "আমাদের আগে নিজেদেরকে ঠিক করতে হবে।"[৫৬]

সাক্ষাৎকারদাতারা তৃণমূল পর্যায়ের সিএসও'দের দুর্বলতার বিষয়েও কথা বলেন এবং জানান, তাঁরা সমন্বিতভাবে সমাজ উন্নয়নের জন্য কাজ করার যে লক্ষ্য তা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। তাঁরা দাবি করেন, সিএসওদের তরুণ সদস্যরা ইদানিং ব্যক্তিগত লাভকে বেশি গুরুত্ব দেন। সাক্ষাৎকারদাতারা বলেন, তরুণরা দিন দিন স্বেচ্ছাশ্রম-এর প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। এর পরিবর্তে তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে সিএসও কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের বিনিময়ে সনদপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। তাছাড়া সিএসও সদস্যদের মধ্যে একটি হতাশাও কাজ করে। সাক্ষাৎকারদাতারা বলেন যে সংগঠনের নিয়মিত বৈঠকগুলোতে সদস্যদের উপস্থিতি আরো বেশি হওয়া দরকার। তাঁরা মনে করেন যে, নিয়মিত বৈঠকে উপস্থিত না থাকার মূল কারণ হলো সদস্যরা মিটিং-এ উপস্থিত থাকার মধ্যে কোনো লাভ খুঁজে পায় না। একটি আইডিআই-এর সময় একজন সাক্ষাৎকারদাতা দাবি করেন যে, কিছু সিএসও নিজেদের সক্ষমতা যাচাই না করেই বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে যায়।[৫৭] সম্ভবত দক্ষতার সীমাবদ্ধতার কারণে তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওগুলো সংগঠনের নথিপত্র তৈরির মতো জটিল কাজ এড়িয়ে যেতে পছন্দ করে। যার ফলে, জবাবদিহিতার ন্যূনতম শর্তটিগুলোও পূরণ হয় না।

উপসংহার এবং সুপারিশমালা

উপরে উল্লেখিত বিস্তারিত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওগুলো যে পরিবেশে কাজ করে সেখানে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বাংলাদেশের ৯টি জেলায় ১১৪টি সিএসও'র ১৩৫ জন প্রতিনিধির সাথে দীর্ঘ আলোচনার উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত চ্যালেঞ্জগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে:

শুধু সিএসওদের সাথে সরকারি সংস্থা নয়, বড় এনজিওগুলোর সাথে তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের মধ্যেও আস্থার অভাব রয়েছে, স্বাধীনভাবে কাজ করতে যাওয়ার সময় সিএসও বিশেষ করে জনগণের মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা সিএসওদের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া, সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের স্বাধীন সত্ত্বাকে হরণ করা, নিবন্ধিত হওয়া এবং নিজেদের লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করার সময় দুর্নীতি এবং আমলাতান্ত্রিক বিলম্বের কারণে সিএসওদের নানা রকমের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা রয়েছে। এটিও পরিস্কার যে সিএসওদের নিজেদের মধ্যেও বিভিন্ন দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সময়ের সাথে সাথে অনেকগুলো বিষয় একযোগে ঘটেছে। প্রথমত, বৃহত্তর সিএসওদের ভেতর থেকে স্বেচ্ছাশ্রমের মনোভাব ধীরে ধীরে কমে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, সিএসওদের রাজনীতিকরণ ঘটেছে এবং এর ফলে বাংলাদেশ সরকার ও সিএসওদের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তৃতীয়ত, বেশি বেশি করে নিবন্ধন করার ফলে সিএসওগুলো এক ধরণের কাঠামোগত রূপ ধারণ করেছে এবং কিছু আর্থিক সহায়তাও পেয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে, নিবন্ধিত হওয়ার মাধ্যমে তারা তাদের স্বাধীনতাকে খর্ব করার সুযোগও করে দিয়েছে।

---

[৫৫] এফজিডি ০৭, ২৪ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল; এফজিডি ১৫, ০১ আগস্ট ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৫৬] আইডিআই ০৭, ২৩ জুলাই ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

[৫৭] আইডিআই ০১, ২০ জুন ২০২৩, গবেষকদের সাথে কথোপকথনের ফাইল।

আমরা এমনটাই উপলব্ধি করেছিলাম যে বৃহত্তর সিএসও কমিউনিটির ১৩৫ জন প্রতিনিধির কাছ থেকে সমাধান খোঁজাই হবে সঠিক কাজ। তাই বাংলাদেশের ৯টি জেলায় মাঠ পর্যায়ের কাজ করার সময়, প্রতিটি এফজিডি এবং আইডিআই-এর শেষে আমরা একটি প্রশ্নই করেছি: এই দেশে সিএসওদের উপস্থিতি আরো শক্তিশালী করার জন্য কী ধরনের সহযোগিতা দরকার? সুপারিশ আকারে আমরা যেসব উত্তর পেয়েছি সেগুলো নিচে বুলেট পয়েন্টের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এবং এগুলো সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ হলো, এই সুপারিশমালা নিঃসন্দেহে মূল্যবান কেননা এর সবগুলোই সরাসরি মাঠ পর্যায়ের সিএসও কর্মীদের কাছ থেকে এসেছে। এসব সুপারিশমালা তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের অস্তিত্বের জন্য যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশ সরকার এবং সিএসও সম্প্রদায়ের উচিত এগুলোকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা। এই সুপারিশমালা বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আইন, বিধি ও নীতিমালা সংস্কারের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে আরো বেগবান করবে বলে আমরা আশা ব্যক্ত করছি।

সিএসওদের প্রতি:

- একটি সংগঠন কখন সিএসও হিসেবে স্বীকৃতি পাবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ একটি পরিষ্কার মাপকাঠি নির্ণয় করতে হবে।
- স্বেচ্ছাশ্রমের আদর্শের উপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং সিএসও'র কর্মকাণ্ডের মধ্যে এই আদর্শ পুণঃস্থাপনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- সিএসও'র স্বাধীন স্বত্বাকে অক্ষুণ্ন রাখার গুরুত্ব অনুধাবন করা, এটি কীভাবে অর্জন করা যেতে পারে সে বিষয়ের উপর আলোকপাত করে সচেতনতামূলক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এটি পরিষ্কার করা দরকার যে, বাংলাদেশে কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সিএসওদের নিবন্ধিত হওয়া আবশ্যক নয়।
- এমন একটি প্ল্যাটফর্ম (সিএসও অ্যালায়েন্স হাব) তৈরি করতে হবে যার মাধ্যমে সিএসও'রা শক্তিশালী হবে, তাদের মধ্যে যোগাযোগ দক্ষতা ও ঐক্য বৃদ্ধি পাবে, নিজেদের চিন্তাভাবনা অন্যকে জানাতে পারবে এবং নানা অভিযোগের শান্তিপূর্ণ সমাধানের উদ্যোগ নিতে পারবে।
- সিএসও বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওগুলোকে আইনি পরামর্শ দিতে পারে এমন আইনি সহায়তা বা পরামর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- এনজিও হিসেবে নিবন্ধিত বড় সিএসওদের সাথে তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের পারস্পরিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করতে হবে।
- সিএসও বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওগুলোকে আর্থিক স্বচ্ছতা এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- আইটি এবং ওয়েবসাইট তৈরি করা এবং এর ব্যবস্থাপনা, সাইবার নিরাপত্তা ইত্যাদি ও আনুষঙ্গিক কারিগরি বিষয়ে সিএসওগুলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান কিছুটা সহায়তা করবে কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাপাসিটি বিল্ডিং/ প্রশিক্ষণ-এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- কীভাবে নিজের সংস্থার জন্য গঠনতন্ত্র তৈরি করতে হয় সে বিষয়ে সিএসওদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- সিএসওদের বাইরেও সব লিঙ্গ, জাতিগোষ্ঠী এবং ধর্মের মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার মানসিকতা তৈরি করতে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক সুস্পষ্ট এবং অর্জনযোগ্য পদ্ধতিসমূহ ও অনুদানের প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে।
- বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরে সিএসওদের জন্য যেসব আর্থিক অনুদান পাওয়ার সুযোগ রয়েছে সেগুলোর একটি সমন্বিত ও সহজলভ্য তথ্যভাণ্ডার তৈরি করতে হবে।

- নারী, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওগুলোকে শক্তিশালী করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এসব প্রক্রিয়ায় যেন পুরুষদের সম্পৃক্ত করা হয় কেননা, পুরুষতান্ত্রিক আচরণ থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে এসব সিএসও সাফল্যের মুখ দেখবে পারবে না।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি:

- নিবন্ধিত হতে ইচ্ছুক এমন সিএসওদের নিবন্ধনের জন্য সুনির্দিষ্ট একটি সাধারণ আইন প্রণয়নের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।
- উপরে উল্লিখিত প্রস্তাবিত সাধারণ আইনটির উপর ভিত্তি করে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে (এনজিওএবি) নিবন্ধিত সিএসওদের বিভিন্ন বিষয় তদারকির একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে আরও শক্তিশালী করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।
- সিএসওগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য সংবিধানে থাকা অনুচ্ছেদগুলো যেন কার্যকর থাকে সে বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে।
- সিএসওদের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির যেকোন অভিযোগ যাতে দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত করে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- নিবন্ধন এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়া হালনাগাদ করার জন্য একটি সহজ, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে। নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল এবং অন্যান্য মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হতে হবে।
- ডিজিটাল নিবন্ধন করা সম্ভব হয় এমন নীতিমালা তৈরি করতে হবে।
- তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের জন্য নিবন্ধন ফি কমাতে হবে।

সিএসও এবং বাংলাদেশ সরকার উভয়ের প্রতি:

- পারস্পরিক বিশ্বাস বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি কমানোর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার এবং সিএসও সহ সকল অংশীদারের মধ্যে উন্মুক্ত আলোচনার উদ্যোগ নিতে হবে।
- তৃণমূল পর্যায়ের সিএসওদের প্রতি সরকারি সংস্থা এবং বৃহত্তর এনজিও ও সিএসও'র বৈষম্যমূলক আচরণ কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পরিশিষ্ট

সাক্ষাৎকার কোড	সিএসও'র সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	তারিখ
এফজিডি ০১	৭	৭	১৯ জুন ২০২৩
এফজিডি ০২	৬	৬	২০ জুন ২০২৩
আইডিআই ০১	১	১	২০ জুন ২০২৩
আইডিআই ০২		১	২০ জুন ২০২৩
এফজিডি ০৩	২	৫	২১ জুন ২০২৩
এফজিডি ০৪	৫	৫	২২ জুন ২০২৩
আইডিআই ০৩	২	১	২১ জুন ২০২৩
আইডিআই ০৪	১	১	২১ জুন ২০২৩
আইডিআই ০৫		১	২২ জুন ২০২৩
আইডিআই ০৬		১	২২ জুন ২০২৩
এফজিডি ০৫	৮	৮	২৩ জুলাই ২০২৩
এফজিডি ০৬	৭	৭	২৩ জুলাই ২০২৩
আইডিআই ০৭	১	১	২৩ জুলাই ২০২৩
এফজিডি ০৭	৫	৬	২৪ জুলাই ২০২৩
এফজিডি ০৮	৬	৬	২৪ জুলাই ২০২৩
এফজিডি ০৯	৭	৭	২৬ জুলাই ২০২৩
এফজিডি ১০	৪	৭	২৬ জুলাই ২০২৩
এফজিডি ১১	৮	৯	২৯ জুলাই ২০২৩
এফজিডি ১২	৩	৭	২৯ জুলাই ২০২৩
এফজিডি ১৩	৭	১২	৩১ জুলাই ২০২৩
এফজিডি ১৪	৭	৮	০১ আগস্ট ২০২৩
এফজিডি ১৫	৮	৮	০১ আগস্ট ২০২৩
এফজিডি ১৬	৮	৮	০১ আগস্ট ২০২৩
এফজিডি ১৭	১২	১৩	২৭ আগস্ট ২০২৩
	সর্বমোট (একত্রিত): ১১৪	সর্বমোট (একত্রিত): ১৩৫	

BRAC UNIVERSITY
Inspiring Excellence
Centre for Peace and Justice
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, (বিল্ডিং-০৭, লেভেল-০৯)
৪৩ মহাখালী সি/এ, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোনঃ (+৮৮) ০৯৬১৭৪৪৫১৭১, ই-মেইলঃ cpj@bracu.ac.bd
ওয়েবঃ cpj.bracu.ac.bd

actionaid
বাড়ি-এস.ই(সি), ৫/বি, (পুরাতন-৮), রোড-১৩৬
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
ফোনঃ (+৮৮০-২) ৫৫০৪৪৮৫১-৫৭
ই-মেইলঃ aab.mail@actionaid.org
ওয়েবঃ www.actionaid.org/bangladesh